শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী

নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪

প্রকাশক :
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
৪এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা ৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ :
অরবিন্দ ঘোষ
১০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান :
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭০০০১২

এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে

এমন যিনি পুত্র, তাঁর বাপ-মা না জানি কী রকম—এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। কে ক্ষুদিরাম, যাঁর ঘরে গদাধর এসে জন্ম নিলেন, আর কে চন্দ্রমণি, যাঁর পায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যহের প্রথম প্রণাম নিবেদিত!

আগে চন্দ্রমণি, পরে ভবতারিণী। আগে গর্ভধারিণী মা, পরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কালিকা।

ছেলের পৈতে-হীন রিক্ত বক্ষ দেখে চন্দ্রমণি ব্যথিত হবেন তারই জন্যে, মায়ের ব্যথার কথা ভেবে, রামকৃষ্ণের বুকের উপর কোঁচার খুঁটটি মেলে ধরা। মায়ের করুণ মুখখানি মনে পড়ে গেল বলে বৃন্দাবনে শ্রীমতীর সাধন ছেড়ে মায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন রামকৃষ্ণ। আর মা যখন দেহ রাখলেন তখন সাধক-চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের সে কী সুগভীর কান্না।

মাকে আ-নিশ্বাস ভালো না বাসলে, মার জন্যে আন্তরিক না কাঁদলে সংসারে যে মাতৃনাম প্রতিষ্ঠিত হয় না, ঈশ্বরকে ডাকা যায় না মা বলে।

সেই জনক-জননীর কাহিনী নির্মল প্রাণে সহজ সুন্দর ভাষায় রচনা করেছেন গ্রন্থকার। বইটি পড়ে তৃপ্তি পেলাম। সকল পাঠকই যে তৃপ্তি পাবেন তাতে সন্দেহ নেই।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণ কায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী

"ঠাকুমা, তোমায় কিছু নিতেই হবে। আমার বাসনা হ'য়েছে তোমায় কিছু দেবার; আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে তোমার চাহিদা মেটাতে আজ আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।" বললেন মথুরানাথ বিশ্বাস; রানী রাসমণির জামাতা ইনি।

—"আমাকে কেন এ কথা বলছ, বাবা? ভগবান তো আমার কোন কিছুরই অভাব রাখেন নি; আমার চাহিদা কিছুই নেই; বেশ আছি আমি।" উত্তর দিলেন অশীতিপর বৃদ্ধা।

—"না ঠাকুমা, আজ কিছুতেই আমি ছাড়ব না। তোমার এতটুকু অভাবও যদি দূর ক'রতে পারি নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আজ তোমাকে বলতেই হবে কি চাই তোমার।"

বৃদ্ধা মুখ তুলে চাইলেন, তারপর যেন ডুবে গেলেন গভীর চিন্তায়; কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'রতে পারলেন না কিসের অভাব তাঁর। আশ্রয় রয়েছে, অনাহারেও নেই তিনি। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে বাস—এ তো জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য নইলে হয় না। না, কোন কিছুরই অভাব তো খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। বৃদ্ধা মথুরানাথকে বললেন—"না বাবা, কোন অভাবই তো খুঁজে পেলাম না আমি।"

—"ঠাকুমা, আজ আমি সংকল্প নিয়ে এসেছি তোমাকে কিছু দেবই; ফিরিয়ে দিও না আমাকে।"

বৃদ্ধার মুখখানি যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; শুষ্ক আঁখি দুটি

মথুরানাথের পানে মেলে ধরলেন তিনি; তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন,—"ছাড়বে না যখন কিছুতেই, একপয়সার দোক্তা এনে দিও, বাবা।"

চমকে উঠলেন মথুরানাথ। এমন প্রলোভন স্বেচ্ছায় কি কেউ উপেক্ষা ক'রতে পারে! কি অনাসক্তি, কি সংযম, ত্যাগের কি অপূর্ব নিদর্শন!

বৃদ্ধাকে প্রণাম জানিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন মথুরানাথ।

এমন মা না হ'লে কি অমন ছেলে জন্মায়!

ইনি চন্দ্রমণি দেবী, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জননী।

হুগলী জেলাব 'দেরে' গ্রাম। সেখানে বাস করতেন মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়; যেমনি নিষ্ঠাবান, তেমনি সদাচারী। ঘরে রয়েছেন গৃহদেবতা রঘুবীর; এঁরই একান্ত উপাসক ছিলেন তিনি। এই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে 'দেরে' গ্রামবাসী সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষুদিরাম; জন্ম ইংরেজী ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে। পিতার সমস্ত সদগুণের অধিকারী হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। অর্থকরী কোন বিদ্বায় পারদর্শিতা লাভ না ক'রলেও তিনি ছিলেন সত্যের পূজারী। এই দীর্ঘদেহী সবল মানুষটি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছিলেন। প্রতিদিন গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজা শেষ না ক'রে জলগ্রহণ ক'রতেন না তিনি। অল্প বয়সে স্ত্রী-বিয়োগের পর চব্বিশ বছর বয়সে তিনি পুনরায় 'সরাটি মায়াপুর' গ্রাম নিবাসী চন্দ্রমণিকে বিবাহ করেন। সেটি ইংরেজী ১৭৯৯ সালের কথা। চন্দ্রমণির বয়স তখন সবেমাত্র

আট বছর। চন্দ্রমণি ছিলেন সুরূপা, সরলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা। তাঁর-সরলতা, স্নেহভালবাসা পরিবারের সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিল। বাড়িতে সকলে তাঁকে ডাকত 'চন্দ্রা' বলে।

মাণিকরামের মৃত্যুর পর সংসার ও বিষয়সম্পত্তির যাবতীয় ভার এসে পড়ল ক্ষুদিরামের ওপর। ক্ষুদিরাম নিষ্ঠাভরে ক'রে চলেন সব কাজ; চন্দ্রমণির গুণে সকলেই মুগ্ধ।

ক্ষুদিরামের বিয়ের পর ষোলটি বছর গেল কেটে নির্বিবাদে। এর মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেছে একটি পুত্র ও একটি কন্যা; রামকুমার ও কাত্যায়নী; এরই পর এল দুর্যোগের দিন।

'দেরে' গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়। প্রজাপীড়নে তাঁর নাকি জোড়া মেলা ভার! এক মিথ্যা মামলা রুজু ক'রেছিলেন তিনি আদালতে; এই মামলার সাক্ষী হিসাবে তলব পড়ল ক্ষুদিরামের। রামানন্দ রায় তাঁকে বললেন—"আপনি ধার্মিক, সত্যবাদী; আপনার জবানবন্দির দাম আছে; আপনাকে এ মামলায় সাক্ষী দিতে হবে।" ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন জমিদারের প্রস্তাব শুনে। মিথ্যা মামলায় সাক্ষী দেবেন ক্ষুদিরাম, রঘুবীরের একনিষ্ঠ পূজারী! এও কি সম্ভব! কুলদেবতা রঘুবীরকে স্মরণ ক'রলেন তিনি। মনে এল অসুরের বল। জমিদারের মুখের ওপর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন—"এ মিথ্যা মামলায় সাক্ষী হ'তে পারব না আমি"।

এত বড় স্পর্দ্ধা সামান্য একজন ব্রাহ্মণের! আভিজাত্যে ঘা লাগল রামানন্দ রায়ের। প্রতিশোধের সুযোগে রইলেন

তিনি। সুযোগ এসে গেল। কিছুদিন পরে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাঁর সম্পত্তি নিলাম ক'রে নিলেন তিনি। সব কিছু গেল চলে; স্থাবর অস্থাবর ব'লে আর কিছুই রইল না তাঁর। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'লেন ক্ষুদিরাম। এখন উপায়। গৃহদেবতা রঘুবীরের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নিবেদন ক'রলেন—"ঠাকুর, অন্যায়কে কোনদিনই প্রশ্রয় দিইনি; সত্যকে আশ্রয় ক'রে রয়েছি চিরকাল; এখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

স্ত্রীপুত্র কন্যার হাত ধ'রে পথে এসে দাঁড়ালেন ক্ষুদিরাম। মনোবল এতটুকুও হারান নি তিনি। সঙ্গে যে র'য়েছেন রঘুবীর। ভয় কি তাঁর। যার কেউ নেই তারই তো রয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে যেতে হয় সম্পূর্ণ রিক্ত হ'য়ে, সকল বাঁধন ছিঁড়ে।

কামারপুকুরের শুকলাল গোস্বামী; ক্ষুদিরামের গুণমুগ্ধ তিনি। খবর এসে পৌঁছল তাঁর কানে। ছুটে এলেন বন্ধুর বিপদে; সাদরে আহ্বান জানালেন ক্ষুদিরামকে কামারপুকুরে; বললেন—"চল কামারপুকুর; খানকয়েক চালাঘর আর বিঘেটাক জমি তোমায় দিচ্ছি।" রাজী হ'লেন ক্ষুদিরাম। ঘর ছেড়ে ঘরে এসে উঠলেন তিনি। এটি ইংরেজী ১৮১৪ সালের ঘটনা। ক্ষুদিরামের বয়স তখন উনচল্লিশ বছর।

কামারপুকুরে এসে আবার গড়ে উঠল শান্তির সংসার। ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ নিজেকে সঁপে দিলেন ক্ষুদিরাম। তাঁর নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা ও সংযম মুগ্ধ ক'রল গ্রামবাসীদের।

ধার্মিকস্বভাবা চন্দ্রমণিও আকর্ষণ ক'রলেন সকলের শ্রদ্ধা।

দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়ে দিন যায় গড়িয়ে। একদিন ম্লান মুখে চন্দ্রমণি স্বামীকে জানালেন—"ঘরে যে চাল নেই কি হবে উপায়? ঘরে র'য়েছে বাছারা, কি দেব এদের মুখে তুলে।"

হেসে উঠলেন ক্ষুদিরাম, সরল স্নিগ্ধ হাসি। ব'ললেন—"যাঁর আশ্রয়ে রয়েছি আমরা সেই প্রাণের ঠাকুরই যদি উপবাস করেন, আমরাও ক'রব।"

কি আত্মবিশ্বাস! কি ধৈর্য্য! এ না হ'লে কি দেবতার অনুগ্রহ হয়!

গ্রামান্তরে গিয়েছেন ক্ষুদিরাম সেদিন। ফেরার পথে পরিশ্রান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন মাঠের ধারে গাছতলায়। পথশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুম নেমে এল দুটি চোখে। স্বপ্ন দেখলেন—রামচন্দ্র বালকবেশে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন তাঁর সম্মুখে; বললেন—"ক্ষুদিরাম, আমি এখানে অনাহারে আর কতকাল প'ড়ে থাকব? তোমার সেবা গ্রহণ করবার বাসনা হ'য়েছে আমার; আমাকে তুমি তোমার কুটীরে প্রতিষ্ঠা কর।"

ক্ষুদিরাম বললেন—"ঠাকুর, আমি যে বড় গরীব; নিজের আহারই জোটাতে পারি না, কেমন ক'রে সেবা করব তোমার।"

অভয় দিলেন বালকবেশী রামচন্দ্র। বললেন—"ভয় নেই, তোমার কোন ত্রুটি ধরব না; তোমার অন্তরের ভক্তিসুধা পান করেই তৃপ্তিলাভ ক'রব আমি। আমি আড়ম্বর চাই না, উপচার চাই। আমাকে তুমি নিয়ে চল তোমার কুটিরে।"

ঘুম ভেঙ্গে গেল ক্ষুদিরামের। এ কি, এই তো সেই স্থান!

শরীরের আলস্য ত্যাগ ক'রে সম্মুখের ধান ক্ষেতে ঢুকে প'ড়লেন ক্ষুদিরাম; নিশ্চয়ই এখানে কোথাও লুকিয়ে আছেন তিনি। ব্যাকুলতা এনে দিল সন্ধান। ও কি, ঐ পাথরের ওপর একটি বিষধর সাপ ফণা মেলে র'য়েছে কেন? হ্যাঁ, এই তো শালগ্রাম শিলা। কিন্তু……একটু দ্বিধা ক'রলেন ক্ষুদিরাম; সাপে যদি ছোবল দেয়! মনের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠল—"যাঁর দেওয়া বিষ, হরণও তো করেন তিনি।" দ্বিধা গেল মুছে। 'জয় রঘুবীর' বলে শালগ্রাম শিলাটি সযত্নে বুকে তুলে নিলেন ক্ষুদিরাম। বিষধর সাপটি নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল! শিলা পরীক্ষা ক'রে বুঝলেন অযাচিতভাবে করুণা ক'রেছেন নারায়ণ।

রঘুবীরের প্রসাদে দূর হ'ল ক্ষুদিরামের অন্নকষ্ট। শুকলালের দেওয়া জমিতে ফসলও ফলল প্রচুর। এবার ক্ষুদিরাম পেলেন অখণ্ড অবসর। ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় হ'য়ে যেতেন তিনি; দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ত ভাবাশ্রু।

ক্ষুদিরামকে শ্রদ্ধা ক'রত সকলেই। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ সংসার পথের পাথেয় হিসাবে গণ্য করত গ্রামের জনসাধারণ।

চন্দ্রমণিকে সকলেই দেখত শ্রদ্ধার চোখে। তাঁর বিশ্বজনীন মাতৃত্ব সকলকেই বেঁধে রেখেছিল স্নেহের ডোরে। অনাথ আতুর, সাধু-সজ্জন সকলেরই তিনি ছিলেন মা; তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত সকলের হৃদয়। দুঃখের দিনে একটু সান্ত্বনার জন্য সকলে ছুটে আসত এই সরলা

মহিলাটির কাছে। সংসারের নীচতা, মলিনতা তাঁকে স্পর্শ করে নি কোনদিন। সংসারী ছিলেন তিনি কিন্তু বৈষয়িক ছিলেন না। অকিঞ্চনতার মাঝে তিনি পেয়েছিলেন ভূমার স্বাদ; সমস্ত হৃদয় জুড়ে ছিল তাঁর অকৃত্রিম স্নেহধারা—ব্যাপ্তি যার সীমাহীন, প্রগাঢ় যার গভীরতা।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়; মোক্তারি ক'রতেন মেদিনীপুরে। ক্ষুদিরামের দুরবস্থার সময় ইনি মাসিক পনের টাকা সাহায্য পাঠাতেন তাঁকে। ক্ষুদিরাম যথেষ্ট স্নেহ ক'রতেন এই ভাগিনেয়টিকে। কিছুদিন খবর না পেলে নিজেই ছুটে যেতেন তাঁর সংবাদ আনতে।

এমনি একবার তাঁর খবর না পেয়ে ক্ষুদিরাম পায়ে হেঁটে চলেছেন মেদিনীপুরে। শীতকাল। কচি বেলপাতার অভাবে শিবপূজার বিঘ্ন হচ্ছে যথেষ্ট। ভোরবেলা থেকে সমানে হেঁটে চ'লেছেন ক্ষুদিরাম। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটি বেলগাছ; কচি পাতায় ভ'রে গেছে গাছের প্রতি শাখা-প্রশাখা। আনন্দে নেচে উঠল ক্ষুদিরামের মন; ভুলে গেলেন মেদিনীপুর, ভুলে গেলেন রামচাঁদকে। গাঁয়ে গিয়ে কিনে আনলেন নতুন ঝুড়ি, নতুন গামছা। বেলপাতায় ঝুড়ি ভর্তি করে ভিজে গামছা চাপা দিয়ে রওনা হ'লেন কামারপুকুরের পথে।

চন্দ্রমণি তো অবাক। ক্ষুদিরাম বললেন—"হ'ল না মেদিনীপুর যাওয়া; সাধ মিটিয়ে আজ পূজা করব শিবের।"

কামারপুকুরে কেটে গেল ন'টি বছর। রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিয়ে হ'য়ে গেছে। অসময়ের বন্ধু শুকলাল

দেহত্যাগ করেছেন। রামকুমার সাহায্য করছেন পিতাকে। ক্ষুদিরামের অন্তর এবার তীর্থ-দর্শনের বাসনায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। সংসারের ভার রামকুমারের ওপর দিয়ে তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে রওনা হ'লেন।

প্রায় একটি বছর গেল কেটে। ফিরে এলেন ক্ষুদিরাম। সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি বাণ-লিঙ্গ। এ-সময় চন্দ্রমণির তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পিতা এর নামকরণ করলেন রামেশ্বর।

রামকুমারের সাহায্যে সংসারের সচ্ছলতা ফিরে এসেছে, ক্ষুদিরাম সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত ক'রেছেন আধ্যাত্মিক জগতে। আর চন্দ্রমণি! নির্বিবাদে সংসারের সব কাজ ক'রে চ'লেছেন গৃহ দেবতা রঘুবীরকে আশ্রয় ক'রে। স্বচ্ছ প্রবাহিনীর মত ব'য়ে চ'লেছে ক্ষুদ্র সংসার, ধীর শান্ত পরিবেশে।

একদিন গ্রামান্তরে গিয়েছেন রামকুমার। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রি। অর্ধরাত্রি প্রায় গত হ'ল। এখনও ফিরে এলেন না তিনি। ব্যস্ত হ'য়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রমণি। মার প্রাণ তো! ব্যাকুল আঁখি দুটি ব্যগ্রতায় চেয়ে রইল পথপানে। চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম। মেটো পথের অনেকখানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। হঠাৎ চমকে উঠলেন চন্দ্রমণি। এই নিশুতি রাত্রে এত রূপ নিয়ে, এত গয়না পরে কে আসছে একা পথ বেয়ে!

—"কে গো তুমি? কোথা থেকে আসছ? গয়নাগাটি পরে এত রাতে একা চলেছ কোথায়?"—একসঙ্গে এতগুলি

প্রশ্ন করে উঠলেন চন্দ্রমণি।

"—তোমার ছেলে যে বাড়িতে পূজা ক'রতে গিয়েছিল, সেখান থেকেই আসছি আমি। তোমার ছেলে এখনি ফিরবে। আমি তোমাদের পাশেই লাহাবাবুদের বাড়ি যাব।" জবাব দিল মেয়েটি।

খুশী হ'লেন চন্দ্রমণি। ভাল লাগল মেয়েটির কথাবার্তা। প্রশ্ন ক'রলেন ফের—"তোমার কানে ও কি গয়না, মা?"

"—এর নাম কুণ্ডল। আমাকে এখুনি যেতে হবে; পরে একদিন আসব তোমার ওখানে।"

চলে গেল মেয়েটি। চন্দ্রমণি চেয়ে দেখলেন রাস্তা ছেড়ে ধানের মরাইয়ের দিকে নেমে গেল সে। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন চন্দ্রমণি, বোধকরি মেয়েটি পথ হারিয়ে ফেলেছে। চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি—"ও দিকে নয় গো।"

কিন্তু কাকে বলছেন সে কথা! ঐ লাবণ্যময়ী কখন মিলিয়ে গেছে বাতাসে; মৌন স্তব্ধতায় চন্দ্রমণির কথাগুলি পাক খেয়ে মিশে গেল অখণ্ড শূন্যতার মাঝে।

—"এ আমি কাকে দেখলাম!" ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলেন চন্দ্রমণি ক্ষুদিরামকে।

—"আজ যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা; মা-ই হয়তো দেখা দিয়েছেন তোমাকে।" শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন ক্ষুদিরাম।

সারা অঙ্গে শিহরণ খেলে গেল চন্দ্রমণির।

মেয়ে কাত্যায়ণীর বড় অসুখ। খবর পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন চন্দ্রমণি। ক্ষুদিরামকে পাঠালেন 'আনুর' গ্রামে। মেয়ের

চাল-চলন, হাবভাব দেখে দেখে বুঝলেন ক্ষুদিরাম অপদেবতায় ভর ক'রেছে একে। প্রশ্ন করলেন তিনি—"হে অপদেতা, তুমি কেন আমার কন্যাকে কষ্ট দিচ্ছ; বল, তোমার তুষ্টির জন্য কি ক'রতে পারি আমি?"

কাত্যায়ণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—"তুমি সত্যবাদী; যদি শপথ কর আমার উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করবে, আমি তোমার কন্যাকে ত্যাগ করে চলে যাব।"

সত্যবদ্ধ হ'লেন ক্ষুদিরাম; রোগমুক্তা হল কাত্যায়ণী।

ক্ষুদিরাম চলেছেন গয়ার পথে; দীর্ঘ পথ। পায়ে হেঁটে চলছেন তিনি। বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান ক'রবেন এই তাঁর বাসনা।

গয়ায় পৌঁছে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন ক্ষুদিরাম; তারপর শান্ত মনে পিণ্ডদান করলেন বিষ্ণুপাদপদ্মে। তৃপ্তি ও প্রশান্তিতে ভ'রে উঠল তাঁর অন্তর। রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন তিনি। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করছেন ক্ষুদিরাম বিষ্ণুপাদপদ্মে। তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তৃপ্তির আনন্দে; বার বার হাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন তাঁরা ক্ষুদিরামকে।

হঠাৎ কোথায় সব কিছু গেল মিলিয়ে; অপূর্ব জ্যোতিতে ভরে উঠল বিষ্ণুমন্দির। ক্ষুদিরাম দেখলেন এক জ্যোতির্ময় মূর্তি সিংহাসনে বসে রয়েছেন; নবদূর্বাদলশ্যাম তাঁর দেহবর্ণ; সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বর্গের দেবতাগণ। ঐ দিব্যমূর্তি স্মিতহাস্যে বললেন ক্ষুদিরামকে—"তোমার ভক্তিতে

আমি তৃপ্ত; তোমার পুত্র হ'য়ে তোমার ঘরে জন্মাব এবার; সেবা নেব তোমার হাতের।" ক্ষুদিরাম বাক্যহারা। সারা দেহে শিহরণ খেলে গেল তাঁর, চোখে এল জল। সম্বিৎ ফিরে এলে করজোড়ে নিবেদন করলেন—"ঠাকুর, আমি যে বড় গরীব; আমার সাধ্য কি তোমার সেবা করি।"

অভয় দিলেন জ্যোতির্ময় মূর্তি; স্মিতহাস্যে বললেন—"তোমার যা জুটবে তাতেই খুশী হব আমি, আমি আড়ম্বর চাই না, ভক্তি চাই। ভক্তির অর্ঘ্যে সাজিয়ে দিও নৈবেদ্য, খুশী হয়ে গ্রহণ করব আমি।"

ঘুম ভেঙে গেল ক্ষুদিরামের। এ স্বপ্ন কি সত্য!

যুগাবতার যখন নরদেহে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি যে রমণীজঠরে আশ্রয় নেন, তাঁর জাগে বিচিত্র অনুভূতি। এ অনুভূতি সাধারণের বোধগম্য নয়। শ্রীরামচন্দ্র জননী কৌশল্যার হয়েছিল এ অনুভূতি; বুদ্ধজননী মায়াদেবী, ঈশাজননী মেরী, শঙ্কর জননী বিশিষ্টা, চৈতন্য জননী শচীদেবী সকলেই পেয়েছিলেন বিচিত্র অনুভূতি, মহামানবের আবির্ভাবের পূর্বাভাস।

চন্দ্রমণিরও ব্যতিক্রম হ'ল না। কিছুদিন হ'তেই তাঁর স্বভাবে এসেছিল অদ্ভুত পরিবর্তন। সর্বজনীন প্রেম যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁকে। সংসারের কোলাহল হতে মন তাঁর উঠে এসেছিল অনেক ঊর্ধ্বে। প্রতিবেশী সকলের মঙ্গল চিন্তাই একমাত্র কাম্য হ'য়ে উঠেছিল তাঁর। কারুর এতটুকু অভাব, কারুর এতটুকু ক্লেশ সহ্য করতে পারতেন না তিনি। বিশ্বসংসারের মানুষকে তিনি যেন দেখতে শুরু

ক'রলেন অপত্যস্নেহে। এমন কি গৃহদেবতা রঘুবীরকেও সেবা করতে লাগলেন পুত্রজ্ঞানে।

শুধু কি তাই। বিচিত্র দিব্যদর্শন হ'তে লাগল তাঁর। কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, কখন বা উদাসীনতায় ঘিরে ধরে তাঁকে; চোখের সামনে নিয়ত দেখেন নানা দেব-দেবীর মূর্তি। কেউ আসছেন রথে চ'ড়ে, কেউ হাঁসের পিঠে, কেউ বা জ্যোতির মাঝখানে। দরজা বন্ধ করে বাইরে শুয়ে আছেন চন্দ্রমণি, কানে এল নূপুরের ধ্বনি; কান খাড়া ক'রে শুনলেন তিনি। চকিতে দরজা খুলে ঢুকে প'ড়লেন ঘরে; শূন্য ঘর, কেউ তো কোথাও নেই।

আর একদিন।

চন্দনের গন্ধে ভ'রে গেছে চারিধার; তারই মাঝে জ্যোতির্ময় ছোট্ট একটি শিশু ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর।

—'ওরে কোলে আয়'—দুহাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন চন্দ্রমণি তাকে। পালিয়ে গেল সে হাত ফসকে।

আবার আর এক রাতে তাঁর মনে হ'ল কে যেন শুয়ে আছে তাঁর শয্যায়। গভীর রাত; স্বামী নেই ঘরে। একি কাণ্ড! আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন চারিধার; কিছুই পেলেন না দেখতে। সংশয় রয়ে গেল মনে।

পরদিন ধনী কামারণীকে ডেকে বললেন সব কথা। ধনী শুনে তো হেসেই অস্থির। বলল—"মর্, বুড়ো বয়সে তোর রঙ্গ দেখে যে আর বাঁচিনে; লোকে শুনলে যে অপবাদ দেবে।

স্বপ্ন দেখেছিস লো, স্বপ্ন দেখেছিস।”

“হবেও বা তাই—” দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রমণি। কিন্তু স্বপ্ন কি চোখ মেলে দেখা যায়! ঘুচল না মনের সন্দেহ।

ফের একদিন। যুগীদের মন্দিরে গিয়েছেন চন্দ্রমণি; সঙ্গে ধনী কামারণী। হঠাৎ চন্দ্রমণি দেখলেন মহাদেবের অঙ্গ থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। সেই আলোর বন্যা পাক খেয়ে প্রবল বেগে ঢুকতে লাগল চন্দ্রমণির দেহে। চিৎকার করে উঠলেন তিনি; শরীর গেল ট'লে। চন্দ্রমণিকে ধ'রে ফেলল ধনী, বলল—“তোর বায়ু রোগ হ'য়েছে।”

গয়া থেকে ফিরে এসে শুনলেন সব ক্ষুদিরাম। যা স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'য়েছিল সেদিন, আজ তা হ'য়ে উঠল স্বচ্ছ, দিনের আলোর মত পরিষ্কার। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে চন্দ্রমণিকে ব'ললেন তিনি—“ওগো, তিনি আসছেন আমাদের ঘরে; এসব যে তারই পূর্বলক্ষণ।”

দিন দিন চন্দ্রমণির রূপ লাবণ্য যেন ফেটে প'ড়ছে। —“এত রূপ এই বুড়ো বয়সে, ওর পেটে অপদেবতা ঢুকেছে নিশ্চয়; বুড়ি এবার বাঁচলে হয়!” কানাকানি শুরু হ'ল পাড়া-প্রতিবেশিনীদের মধ্যে। সংসারি মানুষ ওরা; একটু ব্যতিক্রম দেখলে শিউরে ওঠা যে ওদের স্বভাব।

সময় সময় চন্দ্রমণি ভাবেন—“গোঁসাইয়ে পায়নি তো আমাকে!” শুকলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পর নানারূপ দৈব উৎপাত দেখা যেত গাঁয়ে। মানুষের ধারণা হয়েছিল গোঁসাই বাড়ির সম্মুখের বকুল গাছে প্রেত হ'য়ে রয়েছে। কারুর

স্বভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলেই লোকে বলত—"গোঁসাইয়ে পেয়েছে!"

চন্দ্রমণিকে আশ্বস্ত ক'রলেন ক্ষুদিরাম। বললেন—"লোকের কথায় কান দিও না। ত্রিভুবন আলো করা রূপ নিয়ে আসছেন তিনি আমাদের ঘরে; তাঁরই পরশে হচ্ছে তোমার দিব্যদর্শন। জন্মজন্মান্তরের পুণ্য না থাকলে এ সৌভাগ্য কি কারুর হয়। নির্ভর কর রঘুবীরের ওপর, নির্ভয় হও।"

নির্ভয় হন চন্দ্রমণি।

মাসের পর মাস যায় গড়িয়ে। শীতের শেষে এল বসন্ত। ফাগুন মাস। রঙিন নেশায় মেতে উঠেছে ধরণী। কিশলয় কচি কচি মাথাগুলি দুলিয়ে ছন্দ তুলেছে শাখায় শাখায়। ধরণী আর আকাশ রাঙীন হয়ে উঠেছে নানা রঙে। আনন্দের যেন বান ডেকেছে চারিধারে।

রঘুবীরের ভোগ রাঁধছেন চন্দ্রমণি। হঠাৎ প্রসব বেদনা উঠল; অস্থির হ'য়ে পড়লেন তিনি; এখন কি হবে উপায়! কে রাঁধবে রঘুবীরের ভোগ। হায়, হায়, আজ বুঝি উপোসী হ'য়ে থাকতে হবে রঘুবীরকে। কেঁদে ফেললেন চন্দ্রমণি।

ক্ষুদিরাম আশ্বস্ত ক'রলেন তাঁকে—"ভয় কি? যিনি আসছেন তিনি রঘুবীরের সেবায় ব্যাঘাত ঘটাবেন না। নিশ্চিন্ত হও তুমি। কাল থেকে রঘুবীরের ভোগের ব্যবস্থার জন্য লোক ঠিক করে রেখেছি আমি।"

নির্বিঘ্নে কেটে গেল সারাটি দিন; রাতও প্রায় এল শেস

বর্তমান কামারপুকুর

হ'য়ে। ব্রাহ্মমুহূর্ত। আবার প্রসব বেদনা উঠল চন্দ্রমণির। বাড়িতেই ছিল ধনী কামারণী। চন্দ্রমণিকে নিয়ে ঢেঁকিশালে ঢুকল সে। প্রসব হ'য়ে গেল সুষ্ঠুভাবে।

শিশুর রূপ দেখে মোহিত হ'ল ধনী। এত রূপ, এ তো মানুষের নয়! প্রসূতির পরিচর্যা ক'রে শিশুর পানে চাইতে গিয়ে চমকে উঠল ধনী। এ কি! শিশু গেল কোথায়! এই তো ছিল এখানে। সর্বনাশ হ'ল বুঝি! কপাল চাপড়ে উঠল ধনী। বাতির সলতে হাতে ধ'রে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগল ঘরের চারিধার।

ওমা! এই তো শিশু রয়েছে এখানে! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ধনী পিছল মাটিতে হড়কে ধান সেদ্ধর উনুনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সে। সর্বাঙ্গে বিভূতির প্রলেপ; ত্যাগের চিহ্ন ধারণ ক'রেছে জীবনের শুরুতে! ধনী দুহাতে তুলে নিল শিশুটিকে।

কত বড়, ওমা, ঠিক যেন ছ'মাসের শিশু। ছেলে দেখে আশ আর মেটে না ধনীর! কি লাবণ্য, কি অপরূপ!

ব্রাহ্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি ঘোষণা করল পরমপুরুষের আবির্ভাব। পুব আকাশ রাঙিয়ে উঠেছে নবারুণের দীপ্তিতে; বৃক্ষ শাখায় বিহগের কূজন; মন্দিরে মন্দিরে প্রভাতী অনুষ্ঠানের ঘণ্টাধ্বনি। রাত্রির শেষ, প্রভাতের শুরু। এরই মাঝে চন্দ্রমণির কোল আলো ক'রে মর্ত্যধামে নেমে এলেন নররূপী নারায়ণ—উত্তর-কালের যুগদেবতা পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সেদিন ছিল বুধবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ইংরেজী ১৮৩৬ খৃঃ অব্দ। বঙ্গাব্দ ১২৪২।

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ; জন্মগ্রহণ করেছিলেন কারাগারে। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তিনি। যশোদা লালনপালন ক'রেছিলেন শিশু ও বালক কৃষ্ণকে; তাঁকে গ্রহণ ক'রেছিলেন আপন পুত্ররূপে; সর্বদা শঙ্কিতা হ'তেন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। কি করে জানবেন, এত শঙ্কা যাঁর জন্য, শঙ্কাতারণ যে তিনি নিজেই। বিস্মিতা হ'তেন যশোদা বালকের বল ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে; আবার দুষ্ট বালককে শাসন করার অছিলায় দড়ি দিয়ে বাঁধতে গিয়েও ঘটত নানা অঘটন। অলৌকিক দর্শন হ'য়েছিল তাঁর। তবু তিনি অপত্য-স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন বালক শ্রীকৃষ্ণকে। মানুষ হিসাবেই গ্রহণ ক'রেছিলেন তাঁকে।

চন্দ্রমণিরও ব্যতিক্রম হয়নি কিছু। পুত্রকে সাধারণ মানব-শিশুর মতই দেখেছিলেন তিনি; ঘিরে রেখেছিলেন তাঁকে অপত্য স্নেহ দিয়ে। পুত্রের মঙ্গল কামনায় বার বার গৃহদেবতা রঘুবীরের কাছে জানিয়েছেন আকুতি।

ছেলে কোলে নিয়ে ব'সে আছেন চন্দ্রমণি; রোদ পোহাচ্ছেন তিনি। কিন্তু একি হ'ল! ছেলের ভার যে আর বইতে পারছেন না। তাড়াতাড়ি ছেলেকে নামিয়ে দিলেন কুলোর ওপর। ছেলের ভারে কুলো ভেঙে যায় আর কি! চিৎকার ক'রে উঠলেন তিনি। ছুটে এল ধনী কামারণী। কুলোর কাছে ব'সে মন্ত্র পড়ল সে। সব ঠিক হ'য়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন চন্দ্রমণি।

আর একদিন।

ছেলেকে মশারির মধ্যে শুইয়ে দিয়ে গৃহকর্ম ক'রছেন চন্দ্রমণি; কিছুক্ষণ গেল কেটে। ঘরে ঢুকে দেখলেন মশারির মধ্যে ছেলে নেই। সেখানে শুয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় একটি অপরিচিত পুরুষ। বার বার চোখ রগড়ে দেখলেন চন্দ্রমণি; কিন্তু সেই একই দৃশ্য।

'এ আমার কি সর্বনাশ হ'ল গো'—ছুটে এসে বললেন ক্ষুদিরামকে।

'কই চল তো দেখি'। এলেন ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণির সঙ্গে। অবাক বিস্ময়ে চন্দ্রমণি দেখলেন, ছেলে আপন মনে খেলা ক'রছে মশারির মধ্যে। স্মিতহাস্যে বেরিয়ে এলেন ক্ষুদিরাম ঘরের বাইরে; দাঁড়ালেন এসে গৃহদেবতা রঘুবীরের সম্মুখে। করজোড়ে নিবেদন ক'রলেন—"ঠাকুর, তোমার অপার লীলার অন্ত যে পাই না।"

গরীবের সংসার। একটু দুধের জোগাড় চাই তো। চিন্তিত হ'লেন ক্ষুদিরাম। বিগ্রহ রঘুবীরের পানে চেয়ে বললেন—"আমার অপরাধ নিও না, প্রভু। স্বপ্ন দিয়ে আমার ঘরে এসে ধন্য ক'রেছ আমাকে, তোমার ব্যবস্থা তুমিই কর।"

রামচাঁদ পেয়েছিলেন ক্ষুদিরামের পুত্রের জন্মসংবাদ। মাতুলের অবস্থা চিন্তা ক'রে একটি দুগ্ধবতী গাভী পাঠিয়ে দিলেন কামারপুকুরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন ক্ষুদিরাম, খুশী হ'লেন চন্দ্রমণি।

দিন যায় গড়িয়ে। ক্ষুদিরাম পুত্রের নাম রেখেছেন গদাধর।

দেখতে দেখতে তিনটি বছর গেল কেটে। জন্ম হ'ল কনিষ্ঠা কন্যা সর্বমঙ্গলার। গদাধরের শিক্ষা শুরু হ'ল পিতার কাছে—দেবদেবীর স্তোত্র, রামায়ণের গল্প, পুরাণের উপাখ্যান। অপূর্ব মেধা বালকের। একবার যা শোনে গাঁথা হ'য়ে যায় মনে।

গাঁয়ে রয়েছে লাহাবাবুদের পাঠশালা। সেখানে শুরু হ'ল গদাধরের শিক্ষা, ব্রজেন্দ্রনাথ সরকারের তত্ত্বাবধানে। অঙ্ক মোটামুটি যোগ পর্যন্ত এগিয়ে বিয়োগ আর কিছুতেই ঢুকল না মাথায়। যোগে রয়েছেন যিনি সর্বক্ষণ, বিয়োগের অবকাশ তাঁর কোথায়! বিয়োগ, বিচ্ছেদ তো তাঁর বোধগম্য হবার কথা নয়। পূর্ণ থেকে পূর্ণ গেলে পূর্ণই যে থেকে যায়।

পাঠশালা ছুটির পর এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান গদাধর। সাধু-সন্ত পেলে তো আর কথাই নেই! বিভোর হ'য়ে প'ড়ে থাকেন তাঁদের কাছে। কোনদিন হয়ত ঘরে এলেন কাপড়টি কৌপীনের মত পরে; কোনদিন বা সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে।

'এ কি করেছিস তুই, গদাই?' শিউরে ওঠেন চন্দ্রমণি।

'সাধু হ'য়েছি যে।' হেসে গড়িয়ে পড়েন গদাধর।

একটা অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে চন্দ্রমণির মন। পুত্রের সর্বাঙ্গে কল্যাণহস্ত বুলিয়ে মঙ্গল কামনা করেন রঘুবীরের কাছে।

সেদিন গোচারণের মাঠে ব্রজের বালক সেজে খেলা ক'রতে গেছেন গদাধর; হঠাৎ হ'ল তাঁর ভাব-সমাধি। সঙ্গীরা ভেবে আকুল; কানের কাছে একজন শোনাল কৃষ্ণনাম। যে নামে ভাবসমাধি, সেই নামেই হ'ল সমাধি-মুক্তি।

এমন সমাধি প্রায়ই হ'তে লাগল গদাধরের। চিন্তিত হ'লেন ক্ষুদিরাম, ভাবিতা হ'লেন চন্দ্রমণি। শান্তি স্বস্ত্যয়ন হ'ল; হ'ল ওষুধ পত্তরের ব্যবস্থা; রোগ কিন্তু সারল না মোটেই।

গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজায় ব'সেছেন ক্ষুদিরাম; ধ্যানমগ্ন তিনি; গদাধর কোথা থেকে ছুটে এসে রঘুবীরের পাশে ব'সে পড়লেন; রঘুবীরের ফুলের মালাটি পরে নিলেন নিজের গলায়; আপন অঙ্গে লেপে দিলেন শ্বেত চন্দন। রঘুবীরকে প্রণাম ক'রে চোখ মেললেন ক্ষুদিরাম। প্রত্যাদেশ সত্য হ'ল। পুত্ররূপী বিষ্ণুকে বন্দনা ক'রলেন তিনি। প্রশান্তিতে ভ'রে উঠল সারাটি অন্তর।

ক্ষুদিরামের শরীর গেছে ভেঙে, রামচাঁদের 'সেলামপুরের' বাড়িতে দুর্গোৎসব। সেখানে যাওয়ার বাসনা হ'ল তাঁর। নয়নমণি গদাধরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন তিনি; কিন্তু এতখানি পথ কষ্ট হবে যে বালকের। তার ওপর চন্দ্রমণিও জানালেন আপত্তি—'গদাই চলে গেলে কি নিয়ে থাকব আমি।' বাধ্য হয়ে রামকুমারকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হ'লেন তিনি 'সেলামপুরের' পথে।

রামচাঁদের বাড়ি ভরে উঠেছে আত্মীয়-স্বজনে। চারিদিকে বইছে খুশীর হাওয়া। ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী, তিন দিন গেল কেটে আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়ে। নবমীর দিন হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন ক্ষুদিরাম। চিকিৎসার ত্রুটি হ'ল না; কিন্তু সবই ব্যর্থ হ'য়ে গেল। বার দুই প্রাণের ঠাকুর রঘুবীরের নাম উচ্চারণ ক'রে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন ক্ষুদিরাম।

সব শেষ হ'য়ে গেল। গদাধর তখন সাত বছরের বালক মাত্র।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুর সংবাদে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন চন্দ্রমণি। পুত্র গদাধর সবে পা দিয়েছে সাত বছরে, কন্যা সর্বমঙ্গলাও শিশুমাত্র। এদের মুখ চেয়ে তো বাঁচতে হবে তাঁকে। অন্তর্বেদনা অন্তরে চেপে রেখে শুরু ক'রলেন তিনি সাংসারিক কাজ, সন্তান পালন, রঘুবীরের সেবা।

পিতার মৃত্যুর পর গদাইয়েরও যেন এসেছে অনেক পরিবর্তন। সারাদিনই তিনি থাকেন স্নেহময়ী জননীর পাশে; সাহায্য করেন তাঁকে তাঁর প্রতিটি কর্মে। খুশী হন চন্দ্রমণি, কিন্তু অজানার আহ্বান আবার হাতছানি দিয়ে ডাকে গদাইকে; সব ভুলে যান তিনি; চির উদাসী মন আবার মেতে ওঠে। নীরব হাতছানি উপেক্ষা ক'রতে পারেন না তিনি; বেরিয়ে পড়েন এখানে সেখানে, ভূতির খালের শ্মশানে, মানিকরাজার আম বাগানে।

পাড়া প্রতিবেশী সকলেই ভালবাসে গদাইকে। সকলের মনোহরা সকলকেই ক'রেছেন তিনি বশীভূত। চন্দ্রমণিও ভুলে যান শোক গদাইকে কাছে পেয়ে।

সূর্য ওঠে অস্ত যায়। নিয়মিত বসে পাঠশালা। গদাধরও পাঠশালায় যান বাঁধা নিয়মে। পাঠশালা শেষে ঘোরেন ফেরেন এখানে সেখানে। কখনও বসে বসে কুমোরপাড়ায় মূর্তি গড়া দেখেন নিবিষ্ট চিত্তে; কখনও বা আপন মনে গড়েন ঠাকুর দেবতার মূর্তি। দক্ষ-মৃৎশিল্পী যেন গদাধর। একবার

দেখলেই শেখা হয়ে যায় তাঁর। এর সঙ্গে তো সাধুসঙ্গ রয়েছেই।

আতঙ্কিতা হন চন্দ্রমণি। অজানা আশঙ্কায় ভরে ওঠে তাঁর মন। "বাছাকে যদি সাধু ফকিরেরা ভুলিয়ে নিয়ে যায়!" সেই ভয়; সেই অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কা। শঙ্কাহরণ যিনি, তাঁর অমঙ্গল ক'রবে কে! কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব কি করে বুঝবে নরনারায়ণের লীলা!

অনুযোগ করেন চন্দ্রমণি গদাধরের কাছে—"ও-সব সাধু ফকিবের কাছে যাসনে তুই; কে জানে কার মনে কি আছে।"

হেসে গড়িয়ে পড়েন গদাধর—"আমার জন্য বড্ড ভাব তুমি, মা। কেউ আমার কিছু ক'রতে পারবে না।"

একদিন জনকয়েক সাধু এলেন চন্দ্রমণির কাছে; বললেন —"মা, তোমার ছেলে শুদ্ধ প্রকৃতির; কেউ এর কোন অমঙ্গল ক'রতে পারবে না!"

আশ্বস্তা হ'লেন চন্দ্রমণি:

একদিন গদাধর গেছেন 'আনুর' গ্রামে—বিশালাক্ষী মন্দির দর্শনে; সঙ্গে রয়েছেন ধর্মদাস লাহার কন্যা। হঠাৎ গদাধরের কি হ'ল; পথের মাঝেই জ্ঞান হারালেন তিনি। চন্দ্রমণি শুনলেন সব; ভাবলেন—'এ নিশ্চয়ই বায়ু রোগ।'

গদাধরের বয়স হ'ল ন' বছর। উপনয়ন না দিলে আর নয়। রামকুমারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে উপনয়নের দিন স্থির ক'রলেন চন্দ্রমণি। নির্দিষ্ট দিনে উপনয়ন কর্ম সম্পন্ন হ'ল।

দীক্ষান্তে ব্রহ্মচারীবেশী গদাধর দাঁড়ালেন ভিক্ষার ঝুলি

নিয়ে। চন্দ্রমণি এগিয়ে এলেন ভিক্ষা দিতে। মায়ের ভিক্ষাই প্রথম গ্রহণ ক'রতে হয় এই তো শাস্ত্রের বিধি। বেঁকে বসলেন গদাধর; কথা দিয়েছেন যে তিনি ধনী কামারণীকে। সেই তো প্রথম ভিক্ষা দেবে তাঁকে।

চমকে উঠলেন রামকুমার। এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনি নি। জন্মাবধি সংস্কার। কি ক'রে মুক্ত হবেন তার থেকে। কত অনুনয় ক'রলেন গদাধরকে; কিছুতেই কিছু হ'ল না। পিতার কাছে শিক্ষা পেয়েছেন গদাধর সত্যভ্রষ্ট হবেন না কখনও। পাহাড় রইল অনড় অটল হ'য়ে। বাধ্য হ'য়ে রাজী হ'তে হ'ল তাঁকে।

আর ধনী-কামারণী!

আনন্দ দেখে কে তার। তিলে তিলে অর্থ সঞ্চয় করেছে সে এই দিনটির প্রতীক্ষায়। ভিক্ষার ঝুলি মেলে ধরলেন গদাধর; ধনী উজাড় করে দিল তার সঞ্চয়। গোলকের অধীশ্বরকে ভিক্ষা দিল অখ্যাত পল্লীবালা ধনী-কামারণী। যাঁর করুণার আশায় যোগী ঋষি যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে চলেছেন, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে রিক্ত হ'য়েছেন ভক্তের দল, তাঁকেই আজ কৃপা করল ধনী-কামারণী। এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি জগতে বিরল।

গদাধর আজকাল কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেছেন। পড়াশুনায় মোটেই মন নেই; কিসের চিন্তায় সদাসর্বদাই বিভোর। রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ হ'য়ে গেছে। রামকুমারের স্ত্রী পুত্রবতী হ'তে চলেছেন।

অজানিত আশঙ্কায় দুলে উঠল রামকুমারের মন।

প্রসবকালে স্ত্রীর যে মৃত্যুযোগ আছে! সংসারেও দেখা দিল অমঙ্গলের ছায়া। এ বাড়ির প্রথানুযায়ী রঘুবীরের সেবার পূর্বে কেউই জলগ্রহণ করত না। রামকুমারের স্ত্রী ঘটালেন এর ব্যতিক্রম। বিধির বিধান খণ্ডন করবে কে! একটি পুত্রসন্তান প্রসব ক'রে সূতিকাগারেই দেহত্যাগ করলেন রামকুমারের সহধর্মিনী।

ঘরের বৌ অকালে বিদায় নিল; সমস্ত দায়ভার এসে পড়ল চন্দ্রমণির ওপর। দুধের শিশু তাকেও বুকে তুলে নিলেন তিনি। বয়স হ'য়েছে তাঁর; তবু এই দায়ভার রঘুবীরের ইচ্ছা মনে করেই তুলে নিলেন নিজের কাঁধে।

সংসারের আয় গেছে কমে। রামকুমার ভেঙে পড়েছেন হতাশায়। রামেশ্বর আত্মভোলা মানুষ; সংসারের কোন চিন্তাই নেই তাঁর। বাধ্য হয়ে মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রামকুমার রওনা হ'লেন ক'লকাতার পথে উপার্জনের আশায়। গদাধর প্রায় অভিভাবকশূন্য হয়ে নিজের খেয়াল খুশীকে চরিতার্থ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এখানে সেখানে। সাংসারিক বিপর্যয়ের এতটুকুও ছোঁয়াচ লাগেনি তাঁর মনে।

বালকের এই ঔদাসীন্যে চিন্তিতা হ'লেন চন্দ্রমণি। পল্লীবালা সকলেই ভালবাসে তাঁকে। তাঁর মুখে রামায়ণ গান, মহাভারত, প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান না শুনলে ভাল লাগে না তাদের। গদাধর ধরেন কখন পুরুষ বেশ, কখন সাজেন রমণী। রমণীর বেশে পুরুষ বলে কেউই সন্দেহ করতে পারে না তাঁকে।

বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন। বড় গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ তিনি। তাঁর বাড়ির মেয়েদের অন্দর পেরিয়ে বাইরে যাওয়াব হুকুম নেই। এ নিয়ে দুর্গাদাসের আস্ফালন কম ছিল না।

একদিন গদাধর তন্তুবায় রমণীর বেশে তাঁর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন; দুর্গাদাসের কাছে প্রার্থনা করলেন রাতের জন্য একটু আশ্রয়। এতটুকুও সন্দেহ হ'ল না দুর্গাদাসের। সম্মতি দিলেন গদাধরকে অন্দরে প্রবেশের।

অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে কেটে গেল অনেকক্ষণ। রাত ক্রমে গভীর হ'ল। চিন্তিতা হ'য়ে পড়লেন চন্দ্রমণি। লোক পাঠালেন চারিধারে গদাধরের খোঁজে। রামেশ্বরও ছুটলেন ভাইয়ের সন্ধানে। বণিক পল্লীতে এসে চিৎকার করে ভাইয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন তিনি।

'যাই গো দাদা।' অন্দর মহল থেকে চিৎকার করে উঠলেন গদাধর। তারপর এক ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাড়ির বাইরে। হতবাক হ'য়ে গেল পুরনারীবৃন্দ; অভিমান চূর্ণ হ'ল দুর্গাদাসের।

ক'লকাতায় রামকুমারের চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল; আয়ও বাড়ল কিছু। বৎসরান্তে একবার কামারপুকুরে আসেন তিনি। এবার এসে গদাধরের ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে চন্দ্রমণিকে বললেন—"গদাই তো এখানে পড়াশুনা মোটেই ক'রে না, আমার সঙ্গে বরং কলকাতা চলুক। আমারও খানিকটা সাহায্য হবে, ওর ও পড়াশুনা হবে।"

চন্দ্রমণি বললেন—"সেই ভাল। এখানে তো ও মোটেই

পড়াশুনা করে না, রাতদিন আপন মনে ঘুরে বেড়ায় মাঠে ঘাটে, এখানে সেখানে। তোমার সঙ্গে ক'লকাতায় গেলে ধরাবাঁধার ভেতর থাকবে; লেখাপড়াতেও হয়তো মন বসবে।"

দাদার সঙ্গে গদাধর চলে এলেন ক'লকাতায়; এটি ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ঘটনা।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দ। রাণী রাসমণি নির্মাণ করালেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির। প্রতিষ্ঠিত হ'ল ভবতারিণী মাতৃমূর্তি। মন্দিরের পূজারী হয়ে এলেন রামকুমার। সঙ্গে এলেন গদাধর। ক'লকাতার ঝামাপুকুরের চতুষ্পাটী বন্ধ হ'য়ে গেল।

গদাধর আপন খেয়ালে ঘুরে বেড়ান গঙ্গার তীরে; কখন গান গেয়ে, কখন বা মা, মা, ডাকে সমস্ত প্রান্তরটি মুখর করে। কখন আপন মনে মাটি দিয়ে গড়েন শিবমূর্তি।

একদিন আনমনে মূর্তি গড়ছেন গদাধর, পেছনে এসে দাঁড়ালেন মথুরানাথ। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি অপূর্ব ভাস্কর্য।

"আমাকে দেবে ঐ মূর্তিটা"—বললেন মথুরানাথ।

না দেবার কি আছে! এমন শত শত মূর্তি গড়ে ফেলতে পারেন তিনি নিমেশে।

গদাধরকে দেখে মোহিত হ'লেন রাসমণি; রামকুমারকে প্রশ্ন ক'রলেন—"ছেলেটি কে?"

"আমারই ছোট ভাই।" জবাব দিলেন রামকুমার। গদাধর চেয়ে রইলেন রাসমণির পানে; রাসমণির দৃষ্টি গদাধরের পরে। এ মুখ যেন কত কালের চেনা, কত জন্ম-

জন্মান্তরের। মণিকাঞ্চনের হ'ল যোগ।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দ। সজ্ঞানে দেহত্যাগ ক'রলেন রামকুমার। রাণীর অনুরোধে ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী হ'য়ে এলেন গদাধর। শূন্য মন্দির প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠল মা, মা, ডাকেব ব্যাকুলতায়। ভক্তের আকুল আহ্বানে বিশ্বজননীর অন্তর উঠল কেঁদে। মৃন্ময়ীমূর্তি চিন্ময়ীরূপে দেখা দিল। ভাব সমাধিতে বিলীন হ'লেন গদাধর।

খবর এসে পৌঁছল কামারপুকুরে গদাইয়ের মাথা খারাপ হ'য়েছে। অস্থির হ'য়ে উঠলেন চন্দ্রমণি। মার প্রাণ তো! সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় দুলে উঠল তাঁর মন। বার বার চিঠি লেখালেন রামেশ্বরকে দিয়ে—"চলে আয় কামারপুকুরে; এখানে এলে ভাল হয়ে যাবি তুই; বাছা আমার! কতদিন দেখিনি তোকে।"

মার আহ্বান! একি ব্যর্থ হতে পারে! ছুটে এলেন গদাধর কামারপুকুরে।

—"এ কি চেহারা হ'য়ে গেছে তোর! কত অযত্নে রয়েছিস, বাছা—"কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল চন্দ্রমণির। নয়নমণিকে কাছে পেয়ে স্নেহ আর আশীর্বাদে ভরিয়ে দিলেন তাকে। সুস্থির হলেন গদাধর। হাসি খুশী ভাব এল ফিরে। কিন্তু এ আর কতক্ষণের জন্য!

আবার দেখা দিল সেই অস্থিরতা; সেই মা, মা, ডাক; সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা।

চন্দ্রমণি চেয়ে দেখেন গদাইকে, ভাবেন—"পাগল হ'লে মানুষ

কি এত ভালবাসতে পারে! এই মা, মা, ডাকে কি যে যাদু মেশানো র'য়েছে, প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় একেবারে সুস্থ, কোথায় এতটুকু বেচাল নেই। বোধ হয় এর ওপর কোন অপদেবতা ভর করেছে।" অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল তাঁর মন।

ওঝা এল। পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিল গদাধরকে। গদাধর হাসেন—অবোধ এরা কি ক'রে বুঝবে এই ভাবোন্মত্ততা। হার মানল ওঝা, বলল—'চণ্ড নামাতে হবে।'

এল চণ্ডর ওঝা। হার মেনে ফিরে গেল সে। জানিয়ে গেল গদাধরের কোন ব্যাধি নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চন্দ্রমণি; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন গদাধর। আবার শুরু হ'ল ঘুরে বেড়ান—মাঠে, ঘাটে, শ্মশানে।

প্রতিবেশীরা সহানুভূতি জানাল চন্দ্রমণিকে; বলল—"বিয়ে দাও গদাইয়ের, পাগলামো সেরে যাবে।"

রামেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঘটক লাগালেন চন্দ্রমণি। শুরু হয়ে গেল পাত্রী খোঁজা। কোথাও পাত্রী পছন্দ হয় তো পণে অপারগ হন চন্দ্রমণি; কোথাও বা পণে মেলে তো পাত্রী পছন্দ হয় না।

গদাইয়ের কানে এসে পৌঁছল এ খবর; মাকে বললেন—"আমার জন্য এখানে সেখানে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়েটি কুটো বাঁধা আছে দেখগে যাও।"

লোক পাঠালেন চন্দ্রমণি; এক কথাতেই সব পাকা হ'য়ে

গেল। হাঁফ ছাড়লেন চন্দ্রমণি। তিনশো টাকা পণ। টাকা যোগাড় ক'রতেই কষ্ট হ'ল চন্দ্রমণির; এর ওপর মেয়েকে গহনা দেওয়া। অগত্যা লাহাবাবুদের শরণাপন্ন হ'লেন তিনি।

গদাইয়ের বিয়ে। সকলেই খুশী। স্বেচ্ছায় মত দিয়েছে সে; কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল মনে; ছেলে বিয়ে ক'রতে চ'লেছে বাজনা নেই। মেজবৌঠাকুরুণ তো বলেই ফেললেন সে কথা। গদাধর শুনলেন সব; এর জন্যে ভাবনা! ঠিক আছে, এখুনি ব্যবস্থা করছি। হাত চাপড়ে নাচতে লাগলেন গদাধর; মুখে বোল তুললেন ঢাকের। হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই, যারা দাঁড়িয়েছিল আশে পাশে। চন্দ্রমণিও খুশী হলেন ছেলের আনন্দ দেখে।

শিব ধরা দিলেন পার্বতীর কাছে; শুভ দৃষ্টি হ'ল নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর। স্ত্রী-আচারের সময় সাতাশ কাঠি জ্বেলে প্রদক্ষিণ করল এয়োরা। গদাইয়ের হাতে বাঁধা মাঙ্গলিক সূতো, হলদে রঙ তার, হলুদ মাখানো। সাতাশ কাঠির আগুন লেগে পুড়ে গেল সূতো: খুলে গেল হাতের বাঁধন। হায়, হায় করে উঠল সকলে। মুচকি হাসলেন গদাধর। অবিদ্যার বাঁধন কেটে গেল। অবিদ্যামুক্ত শক্তিকে গ্রহণ করলেন তিনি।

বিয়ে হ'য়ে গেল গদাধরের সারদার সঙ্গে। ধার করা গয়নায় বৌকে সাজিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন চন্দ্রমণি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হ'ল তাঁর। বৌ তো এল ঘরে, এখন গয়নাগুলি

লাহাবাবুদের ফিরিয়ে দেবার কি ক'রবেন তিনি। দুঃখে বুক যেন ফেটে যেতে লাগল তাঁর। কি ক'রে নতুন বৌকে নিরাভরণা ক'রবেন তিনি।

মাকে চিন্তিতা দেখে প্রশ্ন ক'রলেন গদাধর—"মাগো, তোমায় এত মনমরা দেখছি কেন? কি হ'য়েছে তোমার?" গদাইয়ের কথায় চন্দ্রমণিব চোখে জল এল, বললেন—"লাহাবাবুদের কাছ থেকে গয়না ধার করে এনে নতুন বৌকে সাজিয়েছিলাম। ছোট্ট মেয়ে, কেমন ক'রে এখন ওর গা থেকে খুলে নেব সেগুলি। কথা দিয়েছি তাঁদের আজই ফিরিয়ে দেব গয়নাগুলি। এখন কি হবে, গদাই!"

মাকে সান্ত্বনা দিয়ে গদাধর বললেন—"কিছু ভেব না তুমি, মা; আমি খুলে দেব সব গয়না; কিছুই জানতে পারবে না তোমার বৌ। ওকে পরে নতুন গয়না গড়িয়ে দেব আমি।" দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রমণি।

ছ'বছরের ছোট্ট মেয়ে বৌ হয়ে এসেছে এ বাড়ির। সোনার গয়না পরে ঘুমোচ্ছে অঘোরে; চন্দ্রমণি চেয়ে দেখেন তার পানে; অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

ঘুমন্ত সারদার গা থেকে একে একে গয়নাগুলি খুলে নিলেন গদাধর; এতটুকু জানতে পারল না সে; মাকে এসে বললেন—"এই নাও মা গয়না। কিছু জানতে পারেনি তোমার বৌ; এগুলি ফেরত দিয়ে দিও লাহাবাবুদের।"

নতুন বালিকা বধূকে নিরাভরনা দেখে পাত্রীপক্ষ ক্ষুব্ধ হ'ল। সারদাকে নিয়ে সোজা চ'লে গেল তারা জয়রামবাটীতে।

চন্দ্রমণি হাহাকার ক'রে উঠলেন। "কি হবে গদাই, ওরা যদি আর মেয়ে না পাঠায়।"

হেসে উঠলেন গদাধর। স্বচ্ছ সরল হাসি; এতটুকু নেই উদ্বেগ, নেই এতটুকু চাঞ্চল্য। বললেন—"এত ভাবনা কেন তোমার; মেয়ে না পাঠিয়ে ওরা যাবে কোথায়। বিয়ে তো আব নতুন ক'বে হবে না। ভয় নেই মা তোমার; সময় হ'লেই ওর নতুন গয়না গড়িয়ে দেব আমি।"

মাকে দেওয়া কথা রেখেছিলেন গদাধর। হৃদয়কে ডেকে ব'লেছিলেন একদিন—'হৃদু, দেখতো সিন্দুক খুলে কত টাকা জমেছে।" হৃদয় তো অবাক। টাকা পয়সার হিসেব ক'রতে তো দেখেনি কখন মামাকে।

সিন্দুক খুলে টাকাগুলি গুণে জবাব দেয় সে—"তিনশো টাকা, মামা।"

"ঐ টাকা দিয়ে তোর মামীর একটা তাবিজ আর একজোড়া বালা গড়িয়ে দিবি। ওপর হাতে তাবিজ, নীচের হাতে বালা —ডাইমন কাটা বালা।"

কিছুদিন গেল কেটে। গদাধর গেলেন জয়রামবাটীতে। স্বামীর সঙ্গে জোড়ে ফিরলেন সারদা। দুটিকে একসঙ্গে দেখে চোখ জুড়াল চন্দ্রমণির। ভাবলেন, ছেলের রোগ এবার বোধহয় সেরে যাবে। আদর করে সারদাকে ঘরে তুলে নিলেন তিনি।

কামারপুকুরে সারদাকে রেখে গদাধর চ'লে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। আবার দেখা দিল সেই পূর্বাবস্থা। চিকিৎসা

শুরু হ'ল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। খবর শুনে চমকে উঠলেন চন্দ্রমণি। "এই তো বেশ ছিল এখানে; কেন আবার এমন হ'ল! এখন উপায়!" অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় দুলে উঠল মার মন। বার বার আজ মনে পড়ল ক্ষুদিরামের কথা। যখনই মনে জেগেছে সংশয় তখনই তিনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন; নির্ভয় ক'রেছেন তাঁকে; মুছে দিয়েছেন সন্দেহের শেষ চিহ্নটুকু; আজ তিনিও নেই রামকুমারও নেই; আছে রামেশ্বর; নির্বিকার, নির্লিপ্ত সে।

প্রতিবেশিনীদের কানাকানি শুরু হ'ল—"একটা পাগলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিলে, গা।"

মরমে মরে রইলেন তিনি; সারা অন্তর কেঁদে উঠল তাঁর; মা যে তিনি। ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন চন্দ্রমণি পুত্রের আরোগ্য কামনায়।

বাড়ির কাছে শিব মন্দির; ধন্না দিলেন সেখানে। জলস্পর্শ না ক'রে পড়ে রইলেন তিন দিন। প্রত্যাদেশ হ'ল —'যা মুকুন্দপুরে শিবের কাছে।'

ছুটলেন সেখানে চন্দ্রমণি। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুবরণ ক'রতেও রাজী তিনি। পড়ে রইলেন সেখানে জলস্পর্শ না ক'রে। আমরণ পণ; ফিরিয়ে দাও ছেলেকে সুস্থ ক'রে, নয়তো আমায় নাও। স্বপ্ন দেখলেন একরাতে— সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেব; অভয়-হস্ত প্রসারিত; বললেন—"ভয় নেই, ছেলে তোর পাগল নয়; ওর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়েছে।"

আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন চন্দ্রমণি। গৃহদেবতা রঘুবীরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—"ঠাকুর, ওকে তুমি রক্ষা করো।" ত্রিভুবনের পালক যিনি তাঁকে রক্ষা করার জন্য মায়ের কি আকুতি।

১২৭০ সালের কথা।

বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। শেষ বয়সে গঙ্গার তীরে পুত্রের কাছে বসবাসের বাসনা হল তাঁর। এলেন দক্ষিণেশ্বরে। কুঠিঘরের একটি কোঠায় হ'ল তাঁর স্থান। সম্মুখেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী; পাশেই মায়ের মন্দির; শেষ বয়সে এর চেয়ে ভাল স্থান আর কোথায় হ'তে পারে! সব সময়েই গদাধর আসেন খোঁজ খবর নেন মায়ের; গল্প করেন কখন বা দু এক দণ্ড ব'সে। রামকুমারের পুত্র অক্ষয়; সেও থাকে এখানে; ঠাকুমাকে দেখাশোনাও করে সে; আর আছে হৃদয়। আত্মীয় স্বজনের সান্নিধ্যে খুশী হন চন্দ্রমণি।

তোতাপুরী এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। বিধি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। অদ্বৈত সাধনায় দীক্ষিত ক'রবেন গদাধরকে; গদাধরকে দেখে এতটুকুও চিনতে বিলম্ব হ'ল না তাঁর। একেবারে খাঁটি সোনা —এতটুকুও ভেজাল নেই কোথাও।

গদাধরও যেন প্রতীক্ষা করছিলেন এই নাগাসন্ন্যাসীটির। বললেন—"কে তুমি"?

—"আমার নাম তোতাপুরী। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় আমার মঠ ছিল। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে সাধনা করেছি

আমি। নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়েছে আমার। শক্তি ভক্তি এসব মানি না আমি; আমার পথ জ্ঞানের পথ। তুমি চাও এ পথে সাধন ক'রতে?"

—"তাতো জানি না; মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি; মা আমায় যা বলবেন তাই হবে"। বললেন গদাধর।

—"কে তোমার মা?" প্রশ্ন ক'রলেন তোতাপুরী।

গদাধরের মুখে ফুটে উঠল স্বর্গীয় জ্যোতি; নীরবে হাতখানি তুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভবতারিণী মন্দির।

তোতাপুরীর মুখে দেখা দিল তাচ্ছিল্যের হাসি। পাষাণী আবার মা হ'ল কেমন ক'রে। গম্ভীর ভাবে বললেন গদাধরকে—"তিন দিন থাকব এখানে এর মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ ক'রতে হবে তোমাকে।"

"দেখি মার কি ইচ্ছা।" চলে গেলেন গদাধর মায়ের মন্দির পানে। মাকে প্রণাম করে বললেন—"মা, তোতাপুরী আমাকে নির্বিকল্প সাধনায় দীক্ষা দিতে চায়; তিন দিনের বেশী যে ও এখানে থাকবে না। আমাকে বলে দে মা, কি করব আমি।"

ভবতারিণীর মুখ যেন উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। গদাধর স্পষ্ট শুনতে পান মায়ের কণ্ঠস্বর—"তোকে দীক্ষা দেবার জন্যই তো ও এসেছে এখানে। তিন দিনে কোথায় যাবে; ত্যাখ তিন মাসেও যেতে পারে কিনা।"

মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন গদাধর। সোজা চলে এলেন সেখানে, যেখানে আস্তানা নিয়েছিলেন তোতাপুরী।

"কি হ'ল, ব্যাটা, কি বলল তোর পাষাণী মা"—প্রশ্নে

তাচ্ছিল্য যেন উপছে পড়ে।

"পেয়েছি মার প্রত্যাদেশ। দীক্ষা দাও আমাকে তুমি। দ্বৈতভূমি ছেড়ে নিয়ে চল অদ্বৈত ভূমিতে।" বললেন গদাধর।

আনন্দিত হয়ে উঠলেন তোতাপুরী। বললেন "প্রথমে শিখা সূত্র ত্যাগ করে শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রতে হবে তোমাকে।"

চমকে উঠলেন গদাধর। সন্ন্যাস গ্রহণ!

"কিন্তু গোপনে যে ক'রতে হবে আমাকে একাজ।" বললেন গদাধর।

"কিন্তু কেন, কেন এ গোপনীয়তা"। শুধালেন তোতাপুরী।

"জান না বুঝি? আমার গর্ভধারিণী মা যে রয়েছেন এখানে। সব সংস্কার বিসর্জন দিয়ে যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি তিনি বড় আঘাত পাবেন। মা যে আমার গুরুর চেয়েও গরীয়ান্। তাঁকে কি দুঃখ দিতে পারি আমি!" বললেন গদাধর।

"বেশ তাই হবে!" সম্মতি জানালেন তোতাপুরী।

দীক্ষা হ'য়ে গেল গদাধরের। সমস্ত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে নতুন রূপে প্রকাশিত হলেন তিনি। নতুন নামকরণ হ'ল তাঁর। নামও গেল পালটে পদবীও গেল বদলে। গদাধর প্রকাশিত হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে।

অদ্বৈত সাধনার ফলে রামকৃষ্ণের শরীর গেছে ভেঙে; স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি কামারপুকুরে যাওয়া মনস্থ ক'রলেন। চন্দ্রমণিকে সে কথা জানাতে সম্মতি দিলেন তিনি; বললেন— "আমি আর কোথাও যাব না, বাবা; গঙ্গার তীরে শেষ কটি দিন কাটিয়ে যাব।"

সন্ন্যাস গ্রহণের পর অভ্যাস বশত গঙ্গায় পিতৃতর্পণ ক'রতে এলেন রামকৃষ্ণ। মন তখন তাঁর মিশে গেছে বিশ্বের প্রতি অণুকণায়। অঞ্জলি বদ্ধ হাতে জল তুলতে গিয়ে পারলেন না রামকৃষ্ণ; বুঝলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে সকল কর্ম তাঁর শেষ হয়ে গেছে; সংসারি মানুষের মত এবার আর হ'ল না পিতৃতর্পণ।

কামারপুকুরে মাস-ছয় কাটিয়ে অনেকটা সুস্থ শরীর নিয়ে রামকৃষ্ণ ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর শারীরিক উন্নতিতে আনন্দিত হ'লেন সকলে। চন্দ্রমণিও খুশী হলেন পুত্রকে কাছে পেয়ে; শুনলেন তাঁর কাছে ঘরের কথা; পাড়া প্রতিবেশীদের কথা। আর তো যাওয়া হবে না সেখানে; পুরানো স্মৃতি শুনতে ভাল না লাগে কার!

দক্ষিণেশ্বরে এসে রামকৃষ্ণ শুনলেন মথুরানাথ ও তাঁর স্ত্রী তীর্থে যাবেন ব'লে ধুয়ো তুলেছেন। তাঁদের বাসনা রামকৃষ্ণকে সঙ্গীরূপে পেতে। রাজী হ'য়ে গেলেন রামকৃষ্ণ; চন্দ্রমণিকে সেকথা জানাতে খুশী হ'য়ে মত দিলেন তিনি।

শুরু হ'ল তীর্থ পর্যটন। সঙ্গের সাথী হৃদয়ও চলল সঙ্গে। নানা তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বৃন্দাবনে এলেন সকলে। সেখানে 'গঙ্গামায়ী' নামে বর্ষীয়সী একটি ভক্তিমতী সাধিকা বাস করতেন। এই ভক্তিমতী মহিলাকে ভাল লাগল রামকৃষ্ণর। স্থির করলেন তাঁরই আশ্রমে থেকে যাবেন তিনি, দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না। প্রমাদ গুনলেন মথুরানাথ; বিব্রত হ'ল হৃদয়।

হৃদয় প্রশ্ন করল—"এখানে কে দেখবে তোমাকে?"

"কেন ? গঙ্গামায়ী দেখবে। ওর ওখানেই তো থাকব আমি"। সরল উত্তর রামকৃষ্ণর।

হৃদয় দেখল বাঁকা পথে না গেলে ওঁকে ফেরান সম্ভব নয় ; বলল—"মামা, তা বেশ ; কিন্তু দিদিমা যে তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছেন দক্ষিণেশ্বরে। তুমি ফিরে না গেলে কি ব'লব তাঁকে ?"

চকিতে সম্বিৎ ফিরে এল রামকৃষ্ণর। সত্যিইতো আমার পথ চেয়ে ব'সে রয়েছেন মা ; আমি না ফিরলে মনে বড ব্যথা পাবেন তিনি। হৃদয়কে ডেকে বললেন—"চল্, চল্ হৃদু, ফিরে যাই দক্ষিণেশ্বরে। মা যে সকল তীর্থের চেয়েও বড় ; স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী ; সেই মা আমার পথ চেয়ে ব'সে রয়েছেন সেখানে"।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে এই কথা প্রসঙ্গে একদিন রামকৃষ্ণ বললেন—"নারদের কথা কে না জানে। তপস্যায় যেতে পারেন নি যতদিন মা ছিলেন বেঁচে ; মা দেহত্যাগ ক'রলে বেরুলেন হরি সাধনে।

আমার মা বুড়ো হয়েছেন ; রয়েছেন এসে আমার কাছে। মার চিন্তা সব সময় মনে থাকলে ঈশ্বর চিন্তা হবে কি ক'রে। তাইতো চলে এলাম দক্ষিণেশ্বরে ; মায়ের কাছে, মায়ের চোখের সামনে। এখানে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঈশ্বর চিন্তা ক'রতে পারব এবার।"

সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কতদিন দেখেননি রামকৃষ্ণকে, সেবা করেন নি তাঁর। নিজের শরীর গেছে ভেঙে।

চিকিৎসারও প্রয়োজন। ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন রামকৃষ্ণ।

—"কি শরীর হ'য়ে গেছে তোমার? এখুনি ডাক্তার দেখান দরকার। দাঁড়াও সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি আমি"।

—"আমি যাই মার কাছে নহবত ঘরে"। অনুমতি চাইলেন সারদা রামকৃষ্ণর।

—"না, না ওখানে ডাক্তার দেখানোর সুবিধে হবে না। এখানেই থাক তুমি। আমি না থাকলে ওষুধ পথ্যির ব্যবস্থা ক'রবে কে?"

অবাক হ'য়ে গেলেন সাবদা। একে কি পাগল বলে! এত সহানুভূতি, এত দরদ!

রয়ে গেলেন সেখানে সারদা। চিকিৎসক এল; ব্যবস্থা পত্র দিয়ে গেল। ঘড়ি ধ'রে ওষুধ খাওয়ালেন রামকৃষ্ণ; পথ্যি খাওয়ালেন নিজের হাতে।

তিন দিন রয়ে গেলেন সারদা। এবার রামকৃষ্ণ বললেন—"মার কাছে এবার গিয়ে থাকগে।"

চন্দ্রমণি আগে বাস ক'রতেন কুঠিঘরের একটি কোঠায়; সেখানে থাকত অক্ষয়, রামকুমারের পুত্র। অক্ষয় মারা গেছে কিছুদিন পূর্বে; চন্দ্রমণি আশ্রয় নিয়েছেন নিচে নহবত ঘরে—স্বল্পপরিসর, জিনিসপত্তর হাঁড়ি কুঁড়িতে বোঝাই। অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লতেন—"আর কোঠাতে দরকার নেই। গঙ্গাপানে মুখ ক'রে বসে আছি এই বেশ"।

সেই ঘরেই এসে উঠলেন সারদা। অনেকদিন পরে শাশুড়ীর সেবা ক'রতে পেয়ে মন তাঁর তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল।

সারদাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে রামকৃষ্ণের মনে পড়ে যায় তোতাপুরীর কথা। 'বিয়ে করেছ, সাধন করবে স্ত্রীকে কাছে রেখে ; সাবধান, এতটুকুও যেন মনের বৈকল্য না আসে ; স্ত্রীকে গ্রহণ করবে আদ্যাশক্তি রূপে ; সাধনমার্গে তিনি যেন পথ ক'রে দেন তোমার এগিয়ে যাবার'। এই তো সুযোগ এসে গেছে এবার।

সারদা অসুস্থা ; মায়ের ঘরেও স্থানাভাব। রামকৃষ্ণ সারদাকে বলে পাঠালেন—"আজ থেকে আমার ঘরে এসে তুমি থাকবে।"

সারদা সম্মতি চাইলেন চন্দ্রমণির। সম্মতি দিলেন তিনি ; বললেন—"যাও মা, ও যখন ডেকেছে"।

সারদার শারীরিক উন্নতি বিশেষ না হওয়ায় পুনরায় কামারপুকুরে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন। রাজী হলেন রামকৃষ্ণ ; বললেন—"মায়ের সম্মতি নিয়ে এস।" চন্দ্রমণি সম্মতি দিলেন ; বললেন—"এ সাংসার তো দেখে গেলে বাছা, এবার কিছুদিন ও সংসারের হাল দেখে এস।"

চ'লে গেলেন সারদা কামারপুকুরে ; সেখান থেকে যাবেন জয়রামবাটীতে। কিছুদিন যেতে না যেতেই দক্ষিণেশ্বরে খবর এল—রামেশ্বর নেই। উদাসী মানুষ ছিলেন তিনি ; বুঝতে পেরেছিলেন আয়ু তাঁর ফুরিয়ে এসেছে।

রামকৃষ্ণ ব্যথিত হ'লেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদে। "একে একে নিভিছে দেউটি।" কি ক'রে মাকে জানাবেন এই নিদারুণ সংবাদ। মা কি সহ্য করতে পারবেন এই পুত্র শোক!

ছুটে গেলেন রামকৃষ্ণ ভবতারিণী মন্দিরে, কেঁদে বললেন—

"মাগো, আমার মাকে যখন পুত্র শোক দিয়েছিস, সহ্য করবার শক্তি দে তাঁকে।"

এলেন চন্দ্রমণির কাছে শঙ্কিত চিত্তে। ভবতারিণীকে স্মরণ ক'রে শোনালেন সব কথা মাকে। ভেবেছিলেন শোকে বিহ্বল হ'য়ে পড়বেন চন্দ্রমণি। কিন্তু একি হ'ল। নীরবে শুনলেন সব কথা চন্দ্রমণি। বৃদ্ধার চোখের কোলে দেখা দিল দু ফোঁটা জল, শুষ্ক মরুতে বারিপাতের মত। বললেন—"বাবা, সংসার অনিত্য; আজ যা আছে, কাল তা নেই। বৃথা শোক ক'রে কি ক'রব।"

মায়ের কথায় রামকৃষ্ণের দুটি চোখ জলে ভ'রে এল। চন্দ্রমণি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"ছিঃ বাছা, কাঁদতে নেই। তোর কত জ্ঞান, কত বুদ্ধি। তুই উতলা হ'লে অন্য লোকে কি ক'রবে।"

মায়ের কথায় তৃপ্তিতে ভ'রে উঠল রামকৃষ্ণর মন। এমন মা ক'জনে পায়!

চন্দ্রমণির দেখাশোনার ভার নিয়েছে কালীর মা। বার্ধক্যের ভারে অবনত তিনি। রামকুমার গেছে, রামেশ্বর গেছে; বুকে করে মানুষ ক'রেছিলেন অক্ষয়কে, সেও চ'লে গেছে সেদিন। এখন বেঁচে আছে নয়নের মণি গদাই, একে চোখের আড়াল ক'রতে ভয় হয় চন্দ্রমণির। তবু তো রয়েছে একজন। একে রেখে চোখ বুজতে পারলে নিশ্চিন্ত তিনি।

হৃদয়কে আজকাল সহ্য ক'রতে পারেন না চন্দ্রমণি; রামকৃষ্ণকে ডেকে চুপি চুপি বলেন—'ওর কথা শুনিস নে গদাই;

অক্ষয়কে মেরে ফেলেছে ও ; ওতো আত্মীয় নয় শত্তুর।”

হাসেন রামকৃষ্ণ মায়ের কথায় ; ভাবেন, শোকে তাপে বুকখানি ভেঙে গেছে ওঁর।

রাসমণির বাগানের কাছেই আলম বাজারের পাটের কল। সে কলে ভোঁ বাজে দুপুর বেলা। চন্দ্রমণি বলেন—“বৈকুণ্ঠে শাঁক বাজল, এবার খেতে দে।” ছুটির দিন তাঁকে নিয়ে হয় মুশকিল। সেদিন ভোঁ বাজে না ; বৈকুণ্ঠের বাঁশী না শুনতে পেলে তিনিও আহার ক'রবেন না। সেদিন সকলের পক্ষে তাঁকে খাওয়ানো দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ ছেলে ভোলানোর মত মাকে ভুলিতে আহার তুলে দেন তাঁর মুখে।

রোজ ভোরে চন্দ্রমণিকে দর্শন না ক'রলে স্বস্তি পান না রামকৃষ্ণ। কিছুক্ষণ ক'রে রোজই মার সেবা করা চাই তাঁর। মার কোল ঘেঁষে একটু শোওয়া, এ যে তাঁর নিত্য অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তৃপ্তিতে ভ'রে ওঠে বৃদ্ধার মন। কম্পিত শীর্ণা হাতখানি তুলে রামকৃষ্ণের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন তিনি। আশীর্বাদে ভরিয়ে দেন তাঁকে। কত কথা হয় দু'জনে। ঘরের কথা, মায়ের কথা, কামার পুকুরের কথা ; ফেলে আসা দিনের পুরানো স্মৃতি-কথা।

সেদিন হৃদয় তোড়জোড় করছে দেশে যাবে ব'লে। বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে, টিনের স্যুটকেশ গোছানো শেষ। রামকৃষ্ণ বাধা দিলেন তাকে ; বললেন—“হৃদু, জিনিষ পত্তর নিয়ে চলেছিস কোথায় ? এখন তো তোর যাওয়া হতে পারে না।”

বিরক্ত হ'ল হৃদয়; বলল—"কেন যেতে বারণ করছ'? তুমি আমার কোথাও যাওয়ার কথা শুনলেই চমকে ওঠ। আমাকে যেতেই হবে।"

রামকৃষ্ণ বললেন—"কালই বুঝতে পারবি, হৃদে, কেন তোকে যেতে বারণ করছি।"

রাগ কবে জিনিস পত্তর সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল হৃদয়।

রোজ ভোরে কালীর মাকে ডেকে দেন চন্দ্রমণি; সেদিন আর ডাক এল না। সকাল হয়ে গেল। কালীর মা ছুটে গেল চন্দ্রমণির ঘরের দিকে; দ্বার রুদ্ধ। বার কতক দরজায় ঘা দিয়েও সাড়া মিলল না তাঁর। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল কালীর মার। ছুটে গেল সে হৃদয়কে খবর দিতে।

হৃদয় এল ছুটে; এলেন রামকৃষ্ণ। দরজার খিল খুলে ফেলল হৃদয়। শ্বাস উঠেছে চন্দ্রমণির; অচৈতন্য হ'য়ে প'ড়ে রয়েছেন তিনি। চিকিৎসককে ডেকে আনতে ছুটে গেল হৃদয়। এল চিকিৎসক। যমে মানুষে চলল টানাটানি। রামকৃষ্ণ ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল দিতে লাগলেন মায়েব মুখে। অন্তিম কাল এসে গেল। অন্তর্জলির নির্দেশ দিলেন রামকৃষ্ণ।

চন্দ্রমণিকে বয়ে আনা হ'ল গঙ্গার তীরে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পূর্বে যে জননী-জঠরে আশ্রয় নিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, আজ পুণ্য সলিলা ভাগীরথী তীরে ফুল, চন্দন, তুলসী দিয়ে অঞ্জলি দিলেন সেই জননীর দুখানি চরণে। যে পরমপুরুষের স্মরণ অনন্ত যাত্রা পথের পাথেয়, সেই পরমপুরুষই নরদেহে বসে রইলেন চন্দ্রমণির চরণপ্রান্তে; শ্রদ্ধার অঞ্জলি তুলে দিলেন

অন্তিম যাত্রীর যাত্রাপথে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন চন্দ্রমণি। দীর্ঘ পঁচাশি বছরের ইতিহাসের এখানেই পরিসমাপ্তি। এটি ইংরেজী ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ঘটনা।

রামলাল এল ফুল নিয়ে; হৃদয় নিয়ে এল চন্দন। মার দুখানি চরণ গঙ্গার জলে ধুয়ে রামকৃষ্ণ মাখিয়ে দিলেন শ্বেতচন্দন; দু চোখ বেয়ে তাঁর গড়িয়ে এল অশ্রুধারা। এঁড়েদার শ্মশান ঘাটে সৎকার হল রামকৃষ্ণ-জননীর। মুখাগ্নি করল রামলাল। রামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসী। শ্রাদ্ধাদি কর্ম তাঁর নিষিদ্ধ। চিতার লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করল পুণ্যবতী রমণীর মরদেহ। ধীরে নিভে এল অগ্নিশিখা। সব শেষ হ'য়ে গেল। ঘটা ক'রে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হল চন্দ্রমণির। শ্রাদ্ধ করল রামলাল।

গঙ্গার জলে নামলেন রামকৃষ্ণ। মাতৃতর্পণ করবেন এই তাঁর বাসনা। অগণিত মানুষ অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ভাগীরথী তীরে মহাযোগীর তর্পণ দেখবে বলে।

অঞ্জলি ভরে গঙ্গার জল তুলতে গিয়ে পারলেন না রামকৃষ্ণ; আঙুল গেল বেঁকে; একটুও জল রইল না হাতে। বার বার চেষ্টা করেও ব্যর্থকাম হলেন তিনি। অন্তর কেঁদে উঠল। বুঝলেন আধ্যাত্মজগতের যে স্তরে আজ তিনি উঠেছেন সেখান থেকে শাস্ত্রবিধি কোন কর্ম করা আর সম্ভব নয়। কিন্তু শুকনো সন্ন্যাসী তো নন তিনি! তাঁর প্রার্থনা ছিল 'রসে বশে রাখিস মা,'; মাতৃবিয়োগ ব্যথায় তাই কাতর হ'লেন তিনি।

সন্ধ্যা নেমে এল ধরনীর পরে। আকাশের বুকে একে

একে জ্বলে উঠল দীপ মালা। মৃদু সমীরণ ব'য়ে চ'লেছে; পুণ্য-প্রবাহিনী ভাগীরথী তীরে নমে এল ম্লান ছায়া। শ্রান্ত বিহগ কুল ফিরে এল কুলায়।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে রামকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন নির্জন স্রোতস্বিনীর তীরে; আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। দুটি আঁখি বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা—মাতৃঋণ পরিশোধের শেষ সম্বল।

দূর দিগন্তপারে দেখা দিল শশাঙ্ক; চকিতে একখানি কাল মেঘ ঢেকে দিল অম্বর; বিষাদের কালিমায় বুঝি ভ'রে গেল দিগদিগন্ত। বিশ্বচরাচর মৌন ক্রন্দনে যেন ভরিয়ে দিল অনন্ত আকাশ।

মায়ের কথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ বলতেন "ওরে, সংসারে বাপ মা পরমগুরু; যতদিন বেঁচে থাকেন যথা শক্তি ওঁদের সেবা ক'রতে হয়, আর ম'রে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়; যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ ক'রে কাঁদতে হয় তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়। কেবল মাত্র ঈশ্বরের জন্য বাপ মার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা চলে, তাতে দোষ হয় না; যেমন প্রহ্লাদ—বাপ বললেও কৃষ্ণ নাম নিতে ছাড়েনি; কি ধ্রুব—মা বারণ করলেও তপস্যা কর'তে বনে গিয়েছিল, তাতে তাদের দোষ হয়নি।"

সারদামণিকে একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন রামকৃষ্ণ "গয়ায় গিয়ে মার পিণ্ড দিয়ে এস"। চমকে উঠলেন সারদা। সেকি। পুত্র বর্তমান থাকতে এ নির্দেশ কেন। বললেন—"তুমি

তো রয়েছ, তুমি থাকতে আমি পিণ্ড দেব এ কেমন কথা।"

হেসে উঠলেন রামকৃষ্ণ—"হবে গো, হবে, তুমি পিণ্ড দিলেই হবে। গয়ায় যে আমার যাওয়ার উপায় নেই; এ দেহটা যে সেখান থেকেই এসেছে। আমি সেখানে গেলে আর কি ফিরে আসতে পারব।"

চমকে উঠলেন সারদা। বললেন—"থাক কাজ নেই তোমার ওখানে গিয়ে; আমিই যাব, দিয়ে আসব পিণ্ড।"

বুড়ো গোপালকে সঙ্গে নিয়ে সারদামণি গিয়েছিলেন গয়ায়; পিণ্ডদান ক'রে এসেছিলেন বিষ্ণুপাদপদ্মে।

পঁচাশি বছর পূর্ব্বে যে শিশুটি মর্ত্য ধামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, আজ পরিণত বয়সে ঘটল তার পরিসমাপ্তি। সেদিন তিনি এসেছিলেন একাকিনী, প্রতিপালিতা হয়েছিলেন সরলা গ্রাম্য বালিকারূপে; কেই বা জানত সেদিন, এই বালিকা সৃষ্ট হ'য়েছেন এমন এক সন্তানের জন্মদান করতে যাঁর পদতলে সমগ্র জগৎ নোয়াবে মাথা; ছুটে আসবে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মানুষ তাঁর পদপ্রান্তে। যাঁর অমৃতময়ীবাণী বয়ে নিয়ে যাবে এক তেজস্বী পুরুষ, বিশ্বের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে।

ভারতে এমন একদিন ছিল যখন নারায়ণ নরদেহে জন্ম গ্রহণ করতেন মর্ত্যের মানুষের আহ্বানে; মরজগতে মাতৃগর্বে গরীয়ান সেই সব মহীয়সী মহিলা চিরদিনই হ'য়ে রইবেন স্মরণীয়া, বরণীয়া, নমস্যা।